দৈনিক
জনকণ্ঠ

ঢাকা ॥ সোমবার
১৮ ভাদ্র ১৪২৬ বঙ্গাব্দ
২ সেপ্টেম্বর ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

বারিতে লবণাক্ততা সহিষ্ণু গম-ডাল উৎপাদন বৃদ্ধি বিষয়ক কর্মশালা

স্টাফ রিপোর্টার, গাজীপুর ॥ অধিক লবণাক্ততা সহিষ্ণু গম ও ডাল ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে মধ্যবর্তী গবেষণা পর্যালোচনা ও ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনার ওপর ৩ দিনব্যাপী কর্মশালা রবিবার হতে শুরু হয়েছে। গাজীপুরে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের (বারি) সেমিনার কক্ষে এ কর্মশালার উদ্বোধন করেন বারি'র মহাপরিচালক ড. আবুল কালাম আযাদ। প্রধান অতিথির বক্তব্যে বারি'র মহাপরিচালক ড. আবুল কালাম আযাদ বলেন, বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের ডাল ফসল ও গমের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে লবণ ও জলাবদ্ধতা সহিষ্ণু জাত ও প্রযুক্তির ওপর আমাদের গুরুত্বারোপ করতে হবে। তিনি আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সরকারের পরিকল্পনা অনুযায়ী দক্ষিণাঞ্চলের ডাল এবং গমের চাষ বৃদ্ধির জন্য সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের বিজ্ঞানীদের নির্দেশনা প্রদান করেন।

মানবজমিন
সোমবার ২রা সেপ্টেম্বর ২০১৯

বারি'তে লবণাক্ততা সহিষ্ণু ফসল উৎপাদন বিষয়ক কর্মশালা শুরু

স্টাফ রিপোর্টার, গাজীপুর থেকে: বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে অধিক লবণাক্ততা সহিষ্ণু গম ও ডাল ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে মধ্যবর্তী গবেষণা পর্যালোচনা ও ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনার উপর তিন দিনব্যাপী এক কর্মশালা গাজীপুরের বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি) এর সেমিনার কক্ষে শুরু হয়েছে। বারিথর ডাল গবেষণা কেন্দ্রের আয়োজনে এবং এসিআইএআর, অস্ট্রেলিয়া ও কৃষি গবেষণা ফাউন্ডেশন-এর অর্থায়নে এ কর্মশালার আয়োজন করা হয়। রোববার সকালে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে তিন দিনব্যাপী কর্মশালার উদ্বোধন করেন বারি মহাপরিচালক ড. আবুল কালাম আযাদ। বারিথর পরিচালক (ডাল গবেষণা কেন্দ্র) রইছ উদ্দিন চৌধুরী সভাপতিত্বে কর্মশালায় বক্তব্য রাখেন কৃষি গবেষণা ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক ড. ওয়ায়েস কবীর, বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. মো. এছরাইল হোসেন, ড. এরিক হাটনার, রিসার্চ প্রোগ্রাম ম্যানেজার, এসিআইএআর, অস্ট্রেলিয়া প্রমুখ। কর্মশালায় প্রকল্পের সার সংক্ষেপ উপস্থাপন করেন প্রকল্প প্রধান প্রফেসর উইলিয়াম আরর্সকিন, ইউনিভার্সিটি অব ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়া। ওই কর্মশালায় এসিআইএআর, ইউনির্ভাসিটি অব ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়া, সিএসআইআরও, কেজিএফ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, বারিথর বিজ্ঞানীসহ দেশী-বিদেশী প্রায় পঁচাত্তর জন বিজ্ঞানী উপস্থিত ছিলেন। কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে বারিথর

মহাপরিচালক ড. আবুল কালাম আযাদ বলেন, বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের ডাল ফসল ও গমের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে লবণ ও জলাবদ্ধতা সহিষ্ণু জাত ও প্রযুক্তির উপর আমাদের গুরুত্বারোপ করতে হবে।. তিনি আশাবাদ করেন, এ প্রকল্প যথাযথ বাস্তবায়নে লবণ সহিষ্ণু ডাল ও গম ফসলের জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবনের মাধ্যমে দক্ষিণাঞ্চলে ডাল ফসল ও গমের উৎপাদন ব্যাপক হারে প্রসার লাভ করবে।

সংবাদের সাথে প্রতিমুহূর্ত

দৈনিক

আমার বার্তা

The Daily Amar Barta

আজ সোমবার | ঢাকা ■ ১৮ ভাদ্র ১৪২৬ বঙ্গাব্দ ■ ২ মহররম ১৪৪১ হিজরি | ২ সেপ্টেম্বর ২০১৯

বারিতে লবণাক্ততা সহিষ্ণু গম ও ডাল ফসল উৎপাদন বিষয়ক কর্মশালা

গাজীপুর প্রতিনিধি : বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে অধিক লবণাক্ততা সহিষ্ণু গম ও ডাল ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে মধ্যবর্তী গবেষণা পর্যালোচনা ও ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনার উপর তিন দিনব্যাপী এক কর্মশালা গতকাল রোববার বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি) এর সেমিনার কক্ষে শুরু হয়েছে। বারি'র ডাল গবেষণা কেন্দ্রের আয়োজনে এবং এসিআইএআর, অষ্ট্রেলিয়া ও কৃষি গবেষণা ফাউন্ডেশন এর অর্থায়নে "Incorporating salt-tolerant wheat and pulses into smallholder farming systems in southern Bangladesh" প্রকল্পের আওতায় এ কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে তিন দিনব্যাপী কর্মশালার উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট এর মহাপরিচালক ড. আবুল কালাম আযাদ। বারি'র পরিচালক (ডাল গবেষণা কেন্দ্র) জনাব রইছ উদ্দিন চৌধুরী সভাপতিত্বে কর্মশালায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি গবেষণা ফাউন্ডেশন এর নির্বাহী পরিচালক ড. ওয়ায়েস কবীর, বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট এর মহাপরিচালক ড. মো. এছরাইল হোসেন এবং গেষ্ট অব ওনার হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. এরিক হাটনার, রিসার্চ প্রোগ্রাম ম্যানেজার, এসিআইএআর, অষ্ট্রেলিয়া। কর্মশালায় প্রকল্পের সার সংক্ষেপ উপস্থাপন করেন প্রকল্প প্রধান প্রফেসর উইলিয়াম আরস্কিন, ইউনির্ভাসিটি অব ওয়েস্টার্ন অষ্ট্রেলিয়া। উক্ত কর্মশালায় এসিআইএআর, ইউনির্ভাসিটি অব ওয়েস্টার্ন অষ্ট্রেলিয়া, সিএসআইআরও, কেজিএফ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, বারি'র বিজ্ঞানীসহ দেশী-বিদেশী প্রায় পঁচাত্তর জন বিজ্ঞানী উপস্থিত ছিলেন।

কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে বারি'র মহাপরিচালক ড. আবুল কালাম আযাদ বলেন, বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের ডাল ফসল ও গমের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে লবণ ও জলাবদ্ধতা সহিষ্ণু জাত ও প্রযুক্তির উপর আমাদের গুরুত্বারোপ করতে হবে। তিনি এসিআইএআর, অষ্ট্রেলিয়া ও কৃষি গবেষণা ফাউন্ডেশনকে এই প্রকল্পের অর্থায়নের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। এছাড়াও তিনি বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বাংলাদেশ সরকারের পরিকল্পনা অনুযায়ী দক্ষিণাঞ্চলের ডাল এবং গমের চাষ বৃদ্ধির জন্য সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের বিজ্ঞানীদের নির্দেশনা প্রদান করেন এবং আশাবাদ করেন যে, এ প্রকল্প যথাযথ বাস্তবায়নে লবণ সহিষ্ণু ডাল ও গম ফসলের জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবনের মাধ্যমে দক্ষিণাঞ্চলে ডাল ফসল ও গমের উৎপাদন ব্যাপক হারে প্রসার লাভ করবে। কারিগরি সেশনে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিজ্ঞানীগণ তাদের গবেষণা প্রতিবেদন ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা উপস্থাপন করেন।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটে দক্ষিণাঞ্চলে অধিক লবণাক্ততা সহিষ্ণু গম ও ডাল ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয় –আমার বার্তা

dailyobserver

Dhaka Monday September 2, 2019

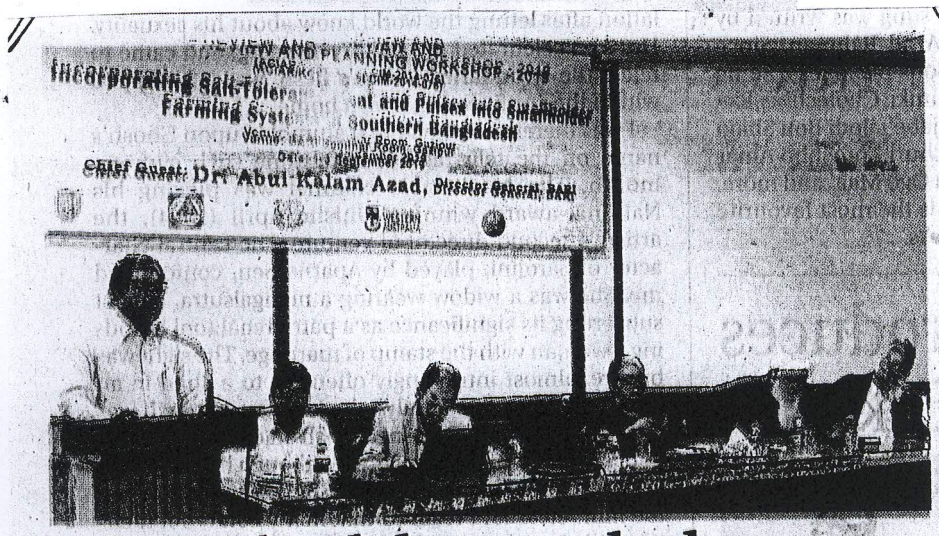

BARI holds workshop on crop production

Eduvista Desk

A three-day-long mid-term review, annual review and planning workshop-2019 aimed at enhancing the production of high salinity tolerant wheat and pulses in the southern part of Bangladesh has been started at the seminar room of Bangladesh Agricultural Research Institute (BARI) yesterday.

BARI Pulse Research Centre has arranged the workshop under the project titled "Incorporating salt-tolerant wheat and pulses into small holder farming systems in southern Bangladesh" funded by the ACIAR, Australia and Krishi Gobeshona Foundation (KGF).

BARI Director General Dr Abul Kalam Azad inaugurated the workshop as chief guest. BARI Director (Pulse Research Centre) Rais Uddin Chawdhury chaired the inaugural session while the Executive Director of the Krishi Gobeshona Foundation (KGF) Dr Wais Kabir and Director General of Bangladesh Wheat and Maize Research Institute Dr Md Israil Hossain, were present as special guests. Dr Eric Huttner, Research Program Manager, CIM, ACIAR, Australia was present as guest of honor. Project leader Prof William Erskine, University of Western Australia presented an overview of the project activities at the workshop. Local and foreign scientists of ACIAR, University of Western Australia, CSIRO, BAU, KGF, and BARI were also present at the workshop.

The Financial Express

Tropicana Tower (4th floor), 45, Topkhana Road, Dhaka-1000
Monday, September 2, 2019
Bhadra 18, 1426 BS: Muharram 2, 1441 Hijri

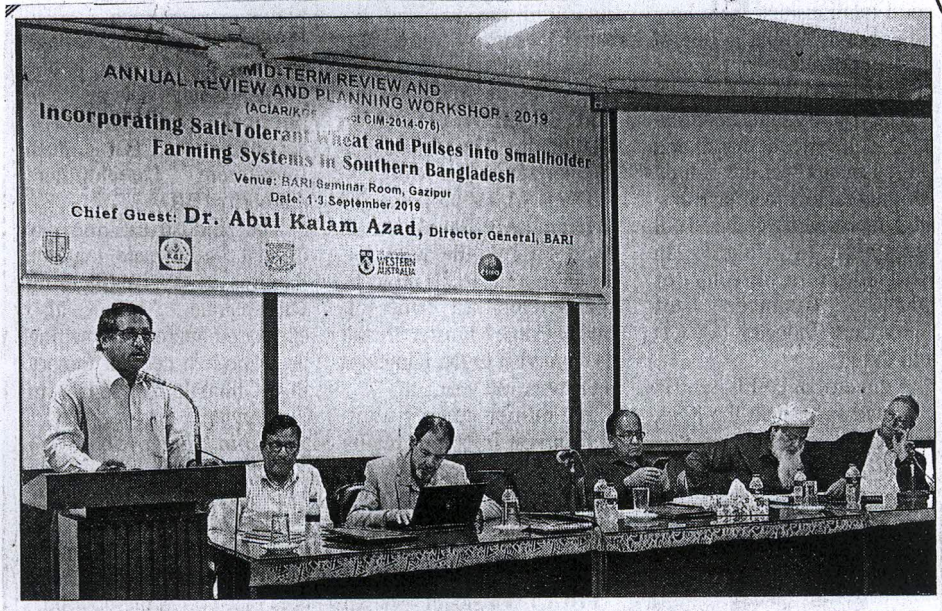

BARI Director General of Bangladesh Agricultural Research Institute (BARI) Dr Abul Kalam Azad speaking at a three-day mid-term review and annual review and planning workshop 2019 aimed at enhancing the production of high salinity tolerant wheat and pulses in the southern part of Bangladesh at the seminar room of BARI in Gazipur on Sunday

MONDAY ▮ 2 SEPTEMBER 2019 ▮ DHAKA

TRUE AND IMPARTIAL

daily sun

SUN PHOTO

Director General of Bangladesh Agricultural Research Institute (BARI), Gazipur Dr Abul Kalam Azad speaks at the inaugural day of a three-day workshop on incorporating salt-tolerant wheat and pulses into smallholder farming systems in southern Bangladesh at its seminar room on Sunday.

Daily INDUSTRY
2 September, 2019

Workshop held at BARI

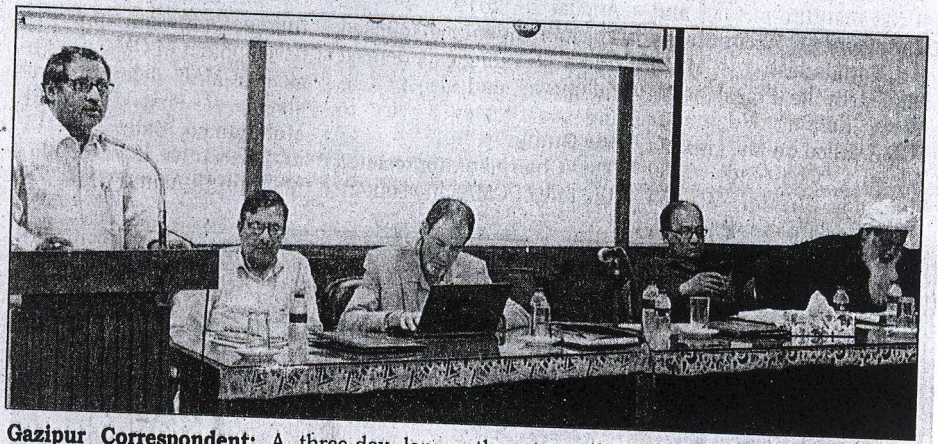

Gazipur Correspondent: A three-day long mid-term review and annual review and planning workshop 2019 aimed at enhancing the production of high salinity tolerant wheat and pulses in the southern part of Bangladesh has been begun at the seminar room of Bangladesh Agricultural Research Institute (BARI) yesterday (Sunday, Sept 1, 2019). BARI Director General Dr. Abul Kalam Azad delivering his speech as chief guest while on the stage (from left) Director General of Bangladesh Wheat and Maize Research Institute Dr. Md. Israil Hossain, Research Program Manager, CIM, ACIAR, Australia Dr. Eric Huttner, Executive Director of the Krishi Gobeshona Foundation (KGF) Dr. Wais Kabir, BARI Director (Pulse Research Centre) Rais Uddin Chawdhury, Professor of the University of Western Australia and project leader William Erskine.

আলোকিত বাংলাদেশ
www.alokitobangladesh.com
রেজিঃ নং-ডিএ ৬১৯৮ ■ বর্ষ ৯ সংখ্যা ৩৫৬
১৮ ভাদ্র ১৪২৬ ■ ২ মহররম ১৪৪১ হিজরি
২ সেপ্টেম্বর ২০১৯

খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তায় অপ্রচলিত ফসলের গুরুত্ব

ড. রীনা রানী সাহা
মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, কৃষিতত্ত্ব বিভাগ
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর

সবুজ বিপ্লবের মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদনে ব্যাপক সাফল্যের পরও বিশ্বব্যাপী মানুষকে প্রতিনিয়ত ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করতে হচ্ছে। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার ২০১৪-১৫ সালের তথ্যানুযায়ী, সারা বিশ্বে ৭৯৫ মিলিয়ন মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করছে, যার অধিকাংশই দক্ষিণ এশিয়া এবং সাব-সাহারা আফ্রিকা অঞ্চলের অধিবাসী। ক্ষুধা ও অপুষ্টি অর্থাৎ অনুপুষ্টির (মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট) অভাবে শারীরিক সঠিক বৃদ্ধি ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যাওয়ার কারণে মানুষের কর্মক্ষমতা লোপ পায়। বর্তমানে বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার ২৪.৩ শতাংশ দারিদ্র্যসীমার নিচে এবং ১২.৯ শতাংশ চরম দারিদ্র্যসীমার নিচে জীবনযাপন করছে, যাদের পুষ্টিহীনতা এবং খাদ্য নিরাপত্তার অভাব নিত্যসঙ্গী। বিশ্বব্যাপী খাদ্য নিরাপত্তা নির্দিষ্ট কিছু ফসলের ওপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল। অথচ পৃথিবীতে বন্য, প্রচলিত ও অপ্রচলিত প্রায় ৩০ হাজার প্রজাতির বিভিন্ন ধরনের খাদ্য-উপযোগী উদ্ভিদের সম্ভার রয়েছে। তার মধ্যে প্রায় ৭ হাজার প্রজাতির উদ্ভিদ বিভিন্ন দেশে চাষাবাদের আওতায় রয়েছে। যদিও ৯৫ শতাংশ খাদ্য চাহিদা মাত্র ৩০ প্রজাতির উদ্ভিদ চাষের মাধ্যমে পূরণ হয়ে থাকে এবং প্রয়োজনীয় ক্যালরি/শক্তির ৬০ শতাংশ জোগান দিয়ে থাকে মাত্র চারটি ফসল যথা- ধান, গম, ভুট্টা ও আলু। তবে বিভিন্ন দেশে শত শত প্রজাতির খাদ্য উপযোগী উদ্ভিদগুলোর অধিকাংশই প্রাকৃতিকভাবে উৎপন্ন হয়ে থাকে বা স্বল্প পরিসরে চাষাবাদ হচ্ছে। এসব ফসলকে অপরিচিত ফসল, নগণ্য ফসল, অপ্রচলিত ফসল, প্রান্তিক ফসল, গরিবের ফসল, এমনকি খাদ্য ও পুষ্টিমানের আধিক্যের কারণে কিছু ফসলকে ভবিষ্যতের ফসল হিসেবেও অভিহিত করা হয়। এসব ফসল সাধারণত দেশ বা অঞ্চলভিত্তিক স্থানীয় জনগণের প্রয়োজনে ব্যবহার করে থাকে এবং ক্ষুদ্র পরিসরে বাজারে বিক্রি করে আয়-উপার্জন করে থাকে। অপ্রচলিত ফসলগুলোর খাদ্যমান, পুষ্টিমান ও অর্থনৈতিক মূল্যায়নের জন্য গবেষণা, উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ কার্যক্রম সারা বিশ্বে প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল।

বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম ঘনবসতিপূর্ণ এবং কৃষিপ্রধান দেশ। অব্যাহতভাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে প্রতি বছর প্রায় ২০ লাখ নতুন মুখ জনসংখ্যার সঙ্গে যোগ হচ্ছে। অন্যদিকে আবাদি কৃষিজমি বিভিন্ন অকৃষি কাজে যেমন- বাড়িঘর, কলকারখানা, রাস্তাঘাট, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ইত্যাদি নির্মাণের কারণে প্রতি বছর ০.৫০ শতাংশ হারে কমে যাচ্ছে। তাছাড়া জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে অসময়ে অতি বৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, খরা, বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, উচ্চতাপমাত্রা এবং উপকূলীয় এলাকায় লবণাক্ততা বৃদ্ধি পাচ্ছে। কাজেই ক্রমবর্ধমান জনগণের জন্য চাহিদা অনুযায়ী খাদ্য উৎপাদন তথা খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা যথেষ্ট ঝুঁকির সম্মুখীন। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার মতে, খাদ্য নিরাপত্তা হচ্ছে- মানুষের কর্মক্ষম ও সুস্থ জীবনযাপনের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্যের চাহিদা অনুযায়ী পছন্দমতো পর্যাপ্ত নিরাপদ এবং পুষ্টিকর খাদ্য প্রাপ্তির বাস্তব ও আর্থিক ক্ষমতা থাকা। অপরদিকে জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট এর ২নং লক্ষ্যমাত্রায় (SDG 2) খাদ্য নিরাপত্তার পাশাপাশি পুষ্টি নিরাপত্তার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া বাংলাদেশ সংবিধানের ১৮ (১) ধারায় 'জনগণের পুষ্টির স্তর উন্নয়ন ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতি সাধনকে রাষ্ট্রের অন্যতম প্রাথমিক কর্তব্য বলে গণ্য করা' এর কথা উল্লেখ আছে। বর্তমানে এদেশ দানা জাতীয় খাদ্যশস্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করলেও পুষ্টি নিরাপত্তায় যথেষ্ট ঘাটতি রয়েছে। এখনও এদেশে ৫ বছরের কম বয়সি ৪১ শতাংশ শিশু পুষ্টিহীনতায় ভুগছে। বিভিন্ন পুষ্টি উপাদানের অভাবে রক্তশূন্যতা, মুখের ঘা, দাঁতের মাড়ি থেকে রক্ত পড়া, বেরিবেরি, গলগণ্ডসহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ে। শিশুরা প্রয়োজনীয় খাদ্য ও পুষ্টির অভাবে খর্বাকৃতির, রুগ্ণ ও উচ্চতার তুলনায় কম ওজন নিয়ে বড় হচ্ছে। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার মতে, দানা জাতীয় খাদ্যের সঙ্গে প্রতিদিন একজন মানুষের ২২০ গ্রাম শাকসবজি এবং ৮৫ গ্রাম ফল খাওয়া দরকার। কিন্তু আমাদের দেশে একজন মানুষ গড়ে ৮০ গ্রাম সবজি ও ৬০ গ্রাম ফল খেতে পায়। সেজন্য এদেশের অধিকাংশ মানুষ পুষ্টিহীনতায় ভোগে। মানুষের সুস্থ সবল দেহের জন্য ভিটামিন ও খনিজ উপাদান সমৃদ্ধ সবজি ও ফল খাওয়া প্রয়োজন এবং তাতে পুষ্টিহীনতা অনেকাংশে লাঘব করা সম্ভব।

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কৃষির অবদান অনস্বীকার্য। প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে এদেশের মানুষের জীবন ও জীবিকা কৃষিনির্ভর। গ্রামীণ জনসংখ্যার মধ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারি কৃষক শতকরা প্রায় ৮০ শতাংশ। আমাদের কৃষিজাত ফসলের সম্ভার বেশ বৈচিত্র্যপূর্ণ। এদেশে দুই শতাধিক বৈচিত্র্যময় ফসল রয়েছে। তার মধ্যে ফল-সবজিসহ শতাধিক অপ্রচলিত বা স্থানীয়ভাবে স্বল্প পরিচিত ফসল আছে। এসব ফসলের অধিকাংশই প্রাকৃতিকভাবে উৎপন্ন হয়ে থাকে এবং কিছু কিছু আবার খুব সীমিত আকারে স্থানীয়ভাবে চাষাবাদ করা হচ্ছে। অপ্রচলিত ফসলগুলো সাধারণত বিভিন্ন প্রতিকূল পরিবেশ যেমন- খরা, জলাবদ্ধতা, লবণাক্ততা এবং অনুর্বর জমিতে টিকে থাকতে পারে। এসব ফসল যুগ যুগ ধরে পারিবারিকভাবে স্থানীয় গ্রামীণ মানুষের খাদ্য পুষ্টির চাহিদা পূরণ করে এবং বাড়তি অংশ শহরাঞ্চলে বাজারজাতের মাধ্যমে আয়-উপার্জনের সুযোগ সৃষ্টি করছে। আবার কিছু কিছু ফসলের ঔষধি গুণের কারণে আয়ুর্বেদিক বা গ্রামীণ কবিরাজি চিকিৎসায় প্রায় ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

অপ্রধান বা কম জনপ্রিয় বা দানা জাতীয় ফসলের মধ্যে বার্লি, জোয়ার, বজরা, চীনা, কাউন; ডাল ফসলের মধ্যে অড়হর, মোটর, স্বল্প পরিসরে প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র কৃষক চরাঞ্চল ও অনুর্বর জমিতে চাষাবাদ করে থাকেন। ফলে এসব ফসলের ফলন অন্যান্য প্রধান ফসলের তুলনায় যথেষ্ট কম হলেও পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। গ্রামাঞ্চলে চীনা ও কাউন দিয়ে খিচুড়ি, পায়েস, মোয়া, নাড়ু ও পিঠা তৈরি করা হয়। বার্লি পুষ্টিগুণে গমের চেয়ে উন্নত। বার্লি দিয়ে শিশু খাদ্য যেমন- ওভালটিন, হরলিক্স প্রভৃতি তৈরি করা হয়। এসব ফসলের উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট গবেষণার মাধ্যমে এরই মধ্যে বেশকিছু জাত উদ্ভাবন করেছে। এ দেশের বনে, জঁঙ্গলে, বাড়ির আঙিনায়, রাস্তার ধারে, বিলে-ঝিলে জন্মানো প্রায় অর্ধশত প্রজাতির সবজি যেমন- কাসাভা, মেটেআলু, মানকচু, ওলকচু, দুধকচু, কালোকচু, মৌলভীকচু, ঘেটকচু, পেন্তাআলু, গাছআলু, ঢেঁকিশাক, শাপলা, সজিনা, তুকাইর, লাফাশাক, পুদিনা, বকফুল ইত্যাদি আমাদের খাদ্য তালিকায় স্থান করে নিয়েছে। এমনকি বিভিন্ন ফসলের মাঠে জন্মানো বিভিন্ন আগাছা যেমন- বথুয়া, থানকুনি, নুনিয়া, হেলেঞ্চা, মালঞ্চ, টিমাশাক, শাকনটে, কাঁটানটে ইত্যাদি সবজি হিসেবে ব্যবহারযোগ্য। প্রাকৃতিকভাবে উৎপন্ন এসব আগাছা দরিদ্র জনগোষ্ঠী, বিশেষ করে অভাব-অনটন এবং দুর্ভিক্ষের সময় বিভিন্ন ফসলের মাঠ বা রাস্তার পাশে বা পতিত জমি থেকে সংগ্রহ করে নিজেদের চাহিদা মিটিয়ে থাকে। অপ্রচলিত সবজি জাতীয় উদ্ভিদের পাতা ও ডগা, ডাঁটা অথবা কন্দ বা রাইজোম, ফুল, ফল বা বীজ খাবার উপযোগী। কিছু কিছু উদ্ভিদের একাধিক অংশ অর্থাৎ পাতা, ডাঁটা, ফল সবই সবজি হিসেবে খাওয়া যায় এবং অধিকাংশ সবজি ভিটামিন 'এ', 'বি' ও 'সি' এবং খনিজ উপাদান আয়রন, ক্যালসিয়াম, পটাসিয়াম, ফলিক এসিড সমৃদ্ধ অর্থাৎ পুষ্টিগুণে ভরপুর। বিশেষ করে সজিনার পাতা, ডাঁটা, ফুল, বীজ, বাকল ও শিকড় বিভিন্ন ভিটামিন, খনিজ উপাদান ও এন্টি-অক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ। টাটকা সজিনা পাতার বিভিন্ন পুষ্টি উপাদান বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, প্রতি ১০০ গ্রাম পাতায় আর্দ্রতা ৭৫ গ্রাম, আমিষ ৬.৭ গ্রাম, স্নেহ ১.৭ গ্রাম, শর্করা ১৩.৪ গ্রাম, আঁশ ০.৯ গ্রাম, ক্যালসিয়াম ০.৪৪ শতাংশ, ফসফরাস ০.০৭ শতাংশ, আয়রন ৭.০ শতাংশ, ভিটামিন-এ ১১৩০০ আইইউ এবং ভিটামিন-সি ৬০ মিলিগ্রাম রয়েছে। সজিনার পাতা ছাড়াও অন্যান্য অংশ যথেষ্ট পুষ্টিকর। সেজন্য বর্তমানে সজিনা বাংলাদেশসহ বিশ্বব্যাপী সমাদৃত।

অন্যদিকে অপ্রচলিত বা স্থানীয়ভাবে জনপ্রিয় বিভিন্ন ফল যেমন- আমড়া, জাম্বুরা, লেবু, কাউফল, কামরাঙা, করমচা, ডেউয়া, ডেফল, দেশিগাব, চালতা, তৈকর, সাতকরা, সফেদা, লটকন, বিলিম্বি, জলপাই, গোলাপজাম, বৈচি, আমলকি, জামরুল, আতা, শরীফা, লুকলুকি, বেতফল, আঁশফল, ফলসা, কাঠবাদাম প্রভৃতি ফল সাধারণত প্রাকৃতিকভাবে বাড়ির আঙিনায় বা বনে-জঙ্গলে বা পতিত জমিতে উৎপন্ন হয়ে থাকে। এসব ফল স্বাদে বেশ বৈচিত্র্যপূর্ণ এবং পুষ্টিগুণে অনন্য। উৎপাদিত এসব ফলফলাদি পারিবারিক চাহিদা মিটিয়ে বাড়তি ফল স্থানীয় ও শহরাঞ্চলের বাজারে বিক্রি করে বাড়তি আয় করার সুযোগ রয়েছে। এরই মধ্যে দেশের বিভিন্ন এলাকায় কিছু কিছু ফল যেমন- নরসিংদীতে লটকন, সিলেটে সাতকরা, বরিশালে আমড়া, খুলনা-বাগেরহাটে সফেদা বাণিজ্যিকভাবে পরিচিতি লাভ করেছে। বৈচিত্র্যময় ফসলগুলো কাঁচা ও পাকা অবস্থায় টাটকা খাওয়া যায়। আবার প্রক্রিয়া জাত করে জ্যাম-জেলি, চাটনি, জুস হিসেবে মূল্য সংযোজন করে বিকল্প আয় উপার্জনের সুযোগ রয়েছে। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট এবং বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের জার্মপ্লাজম সেন্টার কর্তৃক বিভিন্ন অপ্রচলিত বা স্বল্প পরিচিত ফলের বেশকিছু জার্মপ্লাজম সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করেছে এবং গবেষণার মাধ্যমে বেশকিছু জাত উদ্ভাবন করেছে। তবে অন্যান্য প্রযুক্তি যেমন- উৎপাদন কলাকৌশল, প্রক্রিয়াকরণ ও সংরক্ষণ সংক্রান্ত গবেষণা কার্যক্রম জোরদার করা প্রয়োজন রয়েছে।

বাংলাদেশের কৃষি মূলত প্রকৃতিনির্ভর। কাজেই বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে ভবিষ্যতে এ দেশের কৃষি উৎপাদন অধিক পরিমাণে বিরূপ পরিস্থিতি মোকাবিলা করে টিকে থাকতে হবে। তাছাড়া ক্রমহ্রাসমান আবাদি জমি থেকে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্য নিরাপত্তার জন্য খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি যেমন প্রয়োজন, তেমনি অপুষ্টি দূরীকরণে সম্পূরক খাদ্য হিসেবে অপ্রচলিত বা স্থানীয়ভাবে জনপ্রিয় বিভিন্ন ফলফসলের উন্নয়ন প্রয়োজন। কাজেই খাদ্য ও পুষ্টির নিরাপত্তার লক্ষ্যে ভবিষ্যতে কৃষি টেকসই করার জন্য কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে যেমন- ১. প্রচলিত প্রধান প্রধান ফসলের পাশাপাশি বৈচিত্র্যময় পুষ্টিমান সমৃদ্ধ বিভিন্ন ফসলের জার্মপ্লাজম সংগ্রহ, বৈশিষ্ট্যায়ন, মূল্যায়ন, সংরক্ষণ ও ডকুমেন্টেশন জোরদার করা দরকার। ২. প্রতিকূল পরিবেশ উপযোগী এবং অঞ্চলভিত্তিক বিভিন্ন অপ্রচলিত ফসলের জাত উদ্ভাবন, উৎপাদন কলাকৌশল ও প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা। ৩. প্রযুক্তি সম্প্রসারণের জন্য সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। ৪. রাস্তার ধার, পুকুরপাড়, পতিত জমি ও বাড়ির আঙিনায় পারিবারিক সদস্যদের শ্রমের বিনিময়ে এসব ফসলের সমৃদ্ধ ভাণ্ডার গড়ে তোলা এবং বিপণনের ব্যবস্থা করা। ৫. বৈচিত্র্যময় ফসলগুলোর পুষ্টিমান বিশ্লেষণ করে তা প্রচারণার মাধ্যমে জনগণকে সচেতন করা। কাজেই পরিকল্পনা মাফিক বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে অদূর ভবিষ্যতে বাংলাদেশের বর্ধিত জনগণের খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা এবং আয় বৃদ্ধি তথা জীবনমান উন্নয়নে প্রচলিত প্রধান ফসলের পাশাপাশি অপ্রচলিত ফসল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অনস্বীকার্য। ■

> অপ্রচলিত ফসলগুলো সাধারণত বিভিন্ন প্রতিকূল পরিবেশ যেমন- খরা, জলাবদ্ধতা, লবণাক্ততা এবং অনুর্বর জমিতে টিকে থাকতে পারে। এসব ফসল যুগ যুগ ধরে পারিবারিকভাবে স্থানীয় গ্রামীণ মানুষের খাদ্য পুষ্টির চাহিদা পূরণ করে এবং বাড়তি অংশ শহরাঞ্চলে বাজারজাতের মাধ্যমে আয়-উপার্জনের সুযোগ সৃষ্টি করছে। আবার কিছু কিছু ফসলের ঔষধি গুণের কারণে আয়ুর্বেদিক বা গ্রামীণ কবিরাজি চিকিৎসায় প্রায় ব্যবহৃত হয়ে থাকে

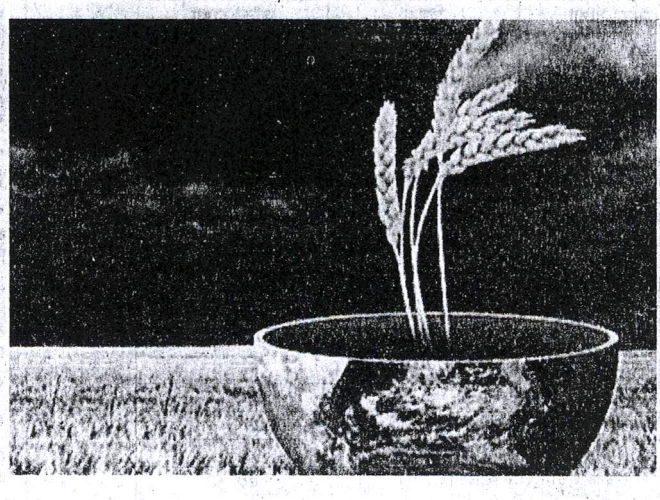

ভোরের কাগজ ঢাকা ■ সোমবার ■ ২ সেপ্টেম্বর ২০১৯

পুষ্টি নিরাপত্তায় ফসলের গুরুত্ব

ড. রীনা রানী সাহা

দেশের অর্থনীতিতে কৃষির অবদান অনস্বীকার্য। প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে এ দেশের মানুষের জীবন ও জীবিকা কৃষিনির্ভর। গ্রামীণ জনসংখ্যার মধ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারি কৃষক প্রায় ৮০ শতাংশ। এ দেশে দুই শতাধিক বৈচিত্র্যময় ফসল রয়েছে। তন্মধ্যে ফল-সবজিসহ শতাধিক অপ্রচলিত বা স্থানীয়ভাবে স্বল্প পরিচিত ফসল আছে। এসব ফসলের অধিকাংশই প্রাকৃতিকভাবে উৎপন্ন হয়ে থাকে এবং কিছু কিছু আবার খুব সীমিত আকারে স্থানীয়ভাবে চাষাবাদ করা হচ্ছে। অপ্রচলিত ফসলগুলো সাধারণত বিভিন্ন প্রতিকূল পরিবেশ যেমন- খরা, জলাবদ্ধতা, লবণাক্ততা এবং অনুর্বর জমিতে টিকে থাকতে পারে।

অপ্রধান বা কম জনপ্রিয় বা দানা জাতীয় ফসলের মধ্যে বার্লি, জোয়ার, বজরা, চীনা, কাউন; ডাল ফসলের মধ্যে অড়হর, মটর, স্বল্প পরিসরে প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র কৃষকরা চরাঞ্চল ও অনুর্বর জমিতে চাষাবাদ করে থাকে। ফলে এসব ফসলের ফলন অন্যান্য প্রধান ফসলের তুলনায় যথেষ্ট কম হলেও পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। বার্লি দিয়ে শিশু খাদ্য তৈরি করা হয়। এসব ফসলের উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট গবেষণার মাধ্যমে ইতোমধ্যে বেশ কিছু জাত উদ্ভাবন করেছে। এ দেশের বনে, জঙ্গলে, বাড়ির আঙিনায়, রাস্তার ধারে, বিলে-ঝিলে জন্মানো প্রায় অর্ধশত প্রজাতির সবজি আমাদের খাদ্য তালিকায় স্থান করে নিয়েছে। এমনকি বিভিন্ন ফসলের মাঠে জন্মানো বিভিন্ন আগাছা যেমন- বথুয়া, থানকুনি, নুনিয়া, হেলেঞ্চা, মালঞ্চ, টিমাশাক, শাকনটে, কাঁটানটে ইত্যাদি সবজি হিসেবে ব্যবহারযোগ্য। এসব উদ্ভিদের একাধিক অংশ অর্থাৎ পাতা, ডাঁটা, ফল সবই সবজি হিসেবে খাওয়া যায় এবং অধিকাংশ সবুজি ভিটামিন 'এ', 'বি' ও 'সি' এবং খনিজ উপাদান, আয়রন, ক্যালসিয়াম, পটাশিয়াম, ফলিক এসিড সমৃদ্ধ অর্থাৎ পুষ্টিগুণে ভরপুর।

অন্যদিকে অপ্রচলিত বা স্থানীয়ভাবে জনপ্রিয় বিভিন্ন ফল সাধারণত প্রাকৃতিকভাবে বাড়ির আঙিনায় বা বনে-জঙ্গলে বা পতিত জমিতে উৎপন্ন হয়ে থাকে। এসব ফল স্বাদে বেশ বৈচিত্র্যপূর্ণ এবং পুষ্টিগুণে অনন্য। উৎপাদিত এসব ফল-ফলাদি পারিবারিক চাহিদা মিটিয়ে বাড়তি ফল স্থানীয় ও শহরাঞ্চলের বাজারে বিক্রি করে বাড়তি আয় করার সুযোগও রয়েছে। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট এবং বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের জার্মপ্লাজম সেন্টার বিভিন্ন অপ্রচলিত বা স্বল্প পরিচিত ফলের বেশ কিছু জার্মপ্লাজম সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করেছে এবং গবেষণার মাধ্যমে বেশকিছু জাত উদ্ভাবন করেছে। তবে অন্যান্য প্রযুক্তি যেমন- উৎপাদন কলাকৌশল, প্রক্রিয়াকরণ ও সংরক্ষণ সংক্রান্ত গবেষণা কার্যক্রম জোরদার করা প্রয়োজন রয়েছে।

বাংলাদেশের কৃষি মূলত প্রকৃতিনির্ভর। কাজেই বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে ভবিষ্যতে এ দেশের কৃষিকে অধিক পরিমাণে রূপ পরিস্থিতি মোকাবেলা করে টিকে থাকতে হবে। এ ছাড়া ক্রমহ্রাসমান আবাদি জমি থেকে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্য নিরাপত্তার জন্য খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি যেমন প্রয়োজন তেমনি অপুষ্টি দূরীকরণে সম্পূরক খাদ্য হিসেবে অপ্রচলিত বা স্থানীয়ভাবে জনপ্রিয় বিভিন্ন ফল-ফসলের উন্নয়ন প্রয়োজন। পরিকল্পনা মাফিক বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে অদূর ভবিষ্যতে বাংলাদেশের বর্ধিত জনগণের খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা এবং আয় বৃদ্ধি তথা জীবনমান উন্নয়নে প্রচলিত প্রধান ফসলের পাশাপাশি অপ্রচলিত ফসলের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অনস্বীকার্য।

মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর।